একবিংশ শতাব্দীর একলব্য

অঞ্জন মজুমদার

২০১৬ সালের জানুয়ারিতে ভারতবর্ষের অন্যতম শিক্ষা প্রতিষ্ঠান হায়দ্রাবাদ সেন্ট্রাল ইউনিভার্সিটির পিএইচডি-র ছাত্র গবেষক রোহিত ভেমুলার মর্মান্তিক মৃত্যু দেশজুড়ে নানান প্রশ্ন তুলেছিল। এরই মধ্যে একটা গোটা বছর কেটে গেছে। আমরা কি ভুলতে বসেছি রোহিত-কে? রোহিত ভেমুলা কি নিজেই নিজেকে শেষ করে দিয়েছিলেন? নাকি আমরাই রোহিতকে হত্যা করলাম? এ প্রশ্নের সদুত্তর তো খুঁজে দেখা হয়নি। এত তাড়াতাড়ি তাঁকে আমরা ভুলি কীভাবে?

আজীবন নিষ্পেষিত এক লড়াকু জীবন জন্ম দিয়েছিল এমন এক উদার চেতনা যার বিস্তার স্পর্শ করতে চেয়েছিল মহাবিশ্বকে, ছড়িয়ে পড়তে চেয়েছিল মহাশূন্যে। সে কি সত্যিই এক সময়ে হার স্বীকার করে নিয়েছিল? তার শেষ চিঠিতে সেরকমটাই লেখা আছে বটে। আমরা তবু মেনে নিতে পারিনি। জন হেনরি কি মেশিনের কাছে পরাজিত হয়েছিলেন? জন হেনরির নামে বীরগাথা রচিত হয়েছিল। তোমার নামে বীরগাথা লিখবে কি কেউ? নাকি, পৌরাণিক পুঁথি পুনরায় সেই রামরাজ্য স্থাপন করতে সফল হল—যেখানে ব্রহ্মবিদ্যা অর্জনে অধিকার থাকবে শুধুই ব্রাহ্মণদের!

রোহিত ভেমুলার জীবন এমন একটি কাহিনি, যা শুনলে মনে হয় চরিত্রটি যেন মহাকাব্য থেকে উঠে এসেছে। গুরু দ্রোণাচার্যের নিষ্ঠুর দাবি মেনে নিয়ে একলব্যকে তার বৃদ্ধাঙ্গুলটি কেটে দিতে হয়েছিল। আর এক্ষেত্রে উপাচার্যের ঈর্ষাসঞ্জাত হিংসার দাবি মেটাতে রোহিতকে তার জীবনটাই বিসর্জন দিতে হল।

রোহিত ভেমুলার জীবনের একটা ছবি আমরা দেখতে পাব রেহিতের শেষ চিঠিতে। আর দেখতে পাব *হিন্দুস্তান টাইমস*-এর ১৮ মে ২০১৬, তারিখে প্রকাশিত সুদীপ্ত মণ্ডলের লেখা অসামান্য অনুসন্ধানের মধ্যে। (http://www.hindustantimes.com/static/rohith-vemula-an-unfinished-portrait)

'পিছড়ে বর্গ তথা দলিত সম্প্রদায়—আমাদের দেশে বহু আলোচিত একটি বিষয়। সংবিধান রচয়িতা হিসেবে পরিচিত শ্রদ্ধেয় বি আর আম্বেদকর থেকে শুরু করে নানান ব্যক্তি নানান প্রসঙ্গে এ বিষয়ে তাঁদের উদ্বেগ প্রকাশ করেছেন। সে উদ্বেগ যে আজও একই ভাবে প্রাসঙ্গিক—রোহিতের মৃত্যু, তা আর একবার যেন চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দিল। আম্বেদকর এবং অন্যদের উদ্বেগের মধ্যে একধরনের চেতনার পরিচয় পাওয়া যায়। দলিত মানুষদের হয়ে রোহিতের চেতনার মান যেন নেহাতই অন্যতর। এ প্রসঙ্গে রোহিত ভেমুলার অন্তিম সময়ে লেখা চিঠি থেকে দুটি লাইন তুলে দিচ্ছি:

> কোনো একজন ব্যক্তির মূল্যায়ন, তার জাতপাতের পরিচিতির মধ্যে বিলীন হচ্ছে অথবা তার 'হয়ে ওঠা' নিকটতম সম্ভাবনার মধ্যেই হ্রস্বীভূত হচ্ছে... এভাবে একজন মানুষকে কখনোই বিচার করা হয় না যে, সে নিজেই এক মহত্তর চেতনার প্রকাশ। এভাবে কখনোই ভাবা হয় না যে, প্রতিটি মানুষই নক্ষত্র কণিকা থেকে সৃষ্টি হওয়া অস্তিত্ব। অথচ, শিক্ষাঙ্গনেই হোক অথবা পথেঘাটে, রাজনীতির ময়দানে, জীবনে-মরণে সর্বক্ষেত্রে বিচারের ধারা সেই একইরকম হ্রস্বীভূত থেকে যায়।

নক্ষত্র-বস্তু কণা থেকে নিজের দেহ মন সৃষ্টি—এমনই এক চেতনার কথা একজন মানুষ প্রকাশ করছে। তার এই যে আত্মোপলব্ধি তা, রোহিতের দলিত চেতনাবোধকে অতিক্রম করে দেশাত্মবোধ—জাতীয়তাবোধ—আন্তর্জাতিকতাবোধ-সবকিছু ছাড়িয়ে এক মহাজাগতিকবোধে উত্তীর্ণ হয়েছে বলে বোধ হয়। আধ্যাত্মিকতার সর্বগ্রাসী আবহকে অতিক্রম করে এক মহত্তর বস্তুচেতনায় উত্তীর্ণ হয়েছিল তার মন। কেবল একজন দলিত মানুষ বলে নয়—বিজ্ঞানচেতনার প্রেক্ষিতে রোহিতের এই যে দার্শনিক প্রত্যয়, তা পৃথিবীর সেরা কসমোলজিস্টদের মধ্যেও সহজে মিলবে বলে আমার মনে হয় না।

রোহিত ভেমুলা কিন্তু মোটেই সহজে আত্মসমর্পণ করে নেবার মতো একটি চরিত্র নয়। আমাদের একবার অন্তত মনে করে নেওয়া দরকার যে, তাঁর বিরুদ্ধে যেসব অবিচার ঘটে

চলেছিল তা নিয়ে রোহিত বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষের কাছে অভিযোগ জানিয়েছিল। তা নিয়ে যতটুকু তদন্ত করা হয়েছে, তাতে কর্তৃপক্ষের তরফে দায়িত্বে যথেষ্ট অবহেলা চিহ্নিত হয়েছে। সেসব বিষয়ের উপর যথার্থ গুরুত্ব দেওয়া হবে—এটা আমরা আশা করেছিলাম। কিন্তু হতাশ হয়ে আমরা লক্ষ করলাম যে, উপর দিকে উঠতে উঠতে অভিযোগের তির শেষ পর্যন্ত একেবারে শীর্ষ কর্তৃপক্ষ তথা উপাচার্যের দিকে যখন নিশানা করল, তখন থেকেই তদন্তের গতি স্তব্ধ হয়ে গেল। অমানবিক আচরণের বিরুদ্ধে অত্যন্ত জরুরি একটি প্রশাসনিক তদন্ত, শেষ পর্যন্ত হিংসক রাজনৈতিক আবর্তে হারিয়ে গেল।

কিন্তু, আমাদের দায়িত্ব শেষ হয়ে যায় না, আমাদের মনে রাখতে হবে রোহিত ও তার সংগ্রামকে। মনে রাখতে হবে যে, মনে রাখাটাও একটা কর্তব্য, পবিত্র উত্তর-দায়িত্ব। আর, রোহিতকে মনে রাখতে তাঁর লেখার চেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপার আর কী থাকতে পারে? আসুন, আমরা পড়ি রোহিতের লেখা, তাঁর শেষ চিঠি।

সুপ্রভাত,

এ চিঠি তোমরা যখন পড়ছ তখন আমি তোমাদের মধ্যে থাকব না। আমার উপর রাগ কোরো না। আমি জানি তোমরা বেশ কয়েকজন আমাকে সত্যিই ভালোবাসতে, আদর-যত্ন করতে, খুবই ভালো ব্যবহার করতে। কারও প্রতি আমার কোনো অভিযোগ নেই। আমার যত সমস্যা তা নিজেকে নিয়েই। এমনটা মনে হচ্ছে যে, আমার দেহ এবং মন—এ দুয়ের মধ্যে ব্যবধান যেন দিনদিন বেড়েই চলেছে। আমি যেন ক্রমেই এক অশুভ শক্তি হয়ে উঠেছি। চিরকাল ভেবে এসেছি আমি একজন লেখক হব। কার্ল সাগানের মতো বিজ্ঞান লেখক হবার স্বপ্ন ছিল আমার। আমি বিজ্ঞান ভালোবাসি, গ্রহ-নক্ষত্র, প্রকৃতি ভালোবাসি—ভালোবাসি মানুষকে। অথচ জানতাম না, প্রকৃতি থেকে মানুষ কবেই বিচ্যুত হয়ে গেছে। আমাদের যত কিছু অনুভূতি, সে সবই যেন সেকেন্ড হ্যান্ড। আমাদের ভালোবাসা সবটাই কৃত্রিম। আমাদের যত বিশ্বাস সবই যেন অতিরঞ্জিত। আমাদের আসল পরিচয় বৈধতা পায় একমাত্র কৃত্রিম শিল্পকলার মধ্যে। কাউকে ভালোবাসলে আঘাত পেতে হবে—এ বাস্তবতা থেকে মুক্তি পাওয়া কঠিন।

কোনো একজন ব্যক্তির মূল্যায়ন, তার জাতপাতের পরিচিতির মধ্যে বিলীন হচ্ছে অথবা তার 'হয়ে ওঠা' নিকটতম সম্ভাবনার মধ্যেই হ্রস্বীভূত হচ্ছে। হ্রস্বীভূত হচ্ছে—একটি ভোটে, একটি নম্বরে, একটি বস্তুতে। এভাবে একজন মানুষকে কখনোই বিচার করা হয় না যে, সে নিজেই এক মহত্তর চেতনার প্রকাশ। এভাবে কখনোই ভাবা হয় না যে, প্রতিটি মানুষই নক্ষত্র কণিকা থেকে সৃষ্টি হওয়া মহান অস্তিত্ব। অথচ, শিক্ষাঙ্গনেই হোক—অথবা পথে-ঘাটে, রাজনীতিতে ময়দানে, জীবনে-মরণে সর্বক্ষেত্রে বিচারের ধারা সেই একইরকম হ্রস্বায়িত থেকে যায়।

জীবনে প্রথমবার এ ধরনের একটি চিঠি লিখছি। প্রথমবার লিখছি শেষ চিঠি। আমার লেখা যদি প্রলাপ হয়ে যায় ক্ষমা করবেন। আমার জন্মটাই ছিল আমার পক্ষে এক মরণান্তিক দুর্ঘটনা। আমার শৈশবের একাকিত্ব আমাকে কোনো দিন মুক্তি দেয়নি। সেই অতীতের শিশুটি, যে কিনা কখনো কোনো প্রশংসা পায়নি। অবশ্য, এমনটাও হতে পারে যে সবই ছিল আমার বোঝার ভুল। হয়তো পৃথিবীকে ঠিক মতো বুঝে ওঠার ভুল। প্রেম-যন্ত্রণা জীবন-মরণ, এসব বুঝতেই হয়তো ভুল থেকে গেছে। হয়তো তাড়াহুড়োর কিছুই ছিল না—অথচ আমি কেবলই ছুটে চলেছি—একটা জীবন শুরু করবার উদগ্র আকাঙ্ক্ষা নিয়ে। যাই হোক, এরই মধ্যে কিছু মানুষ থাকে যাদের ক্ষেত্রে জীবনটাই যেন অভিশাপ।

এই মুহূর্তে আমি আহত নই, বিষণ্ণ নই, আমি শুধুই এক শূন্যতা। নিজের বিষয়ে আর আগ্রহী নই। আর সেটা বড়োই মর্মান্তিক। এবং সে কারণেই আমি এটা করতে যাচ্ছি। আমি চলে যাবার পর লোকে আমাকে কাপুরুষ বলতে পারে—বলতে পারে স্বার্থপর অথবা নির্বোধ। সে ব্যাপারে আমার কোনো মাথাব্যথা নেই। মৃত্যুর পরে আত্মা বা ভূত সেইসব কাহিনিতে আমার বিশ্বাস নেই। বিশ্বাস যদি কোথাও কিছুমাত্র থাকে, সেটা হল আমি সুদূর নক্ষত্রে পরিক্রমা করতে পারব। অন্য পৃথিবীদের জানতে পারব।

তোমরা, যারা এই কাহিনি পড়লে, আমার জন্য কিছু যদি করতে পারো, তা হলে জানাই, আমার স্কলারশিপ বাবদ ১,৭৫,০০০ টাকা পাওনা পড়ে আছে। সে টাকাটা যাতে আমার পরিবারের হাতে পৌঁছায়, তা অনুগ্রহ করে দেখো। আমার বন্ধু রামজি—তার কাছে আমার ৪০,০০০ টাকার মতো দেনা রয়ে গেছে। একবারের জন্যেও টাকাটা সে ফেরত চায়নি। ওই টাকা থেকে অনুগ্রহ করে সেটা তাকে ফেরত দেবার ব্যবস্থা কোরো।

আমার অন্ত্যেষ্টি নীরবে নিভৃতে হোক। আমি শুধুমাত্র এসেছিলাম এবং চলে গেলাম—মাত্র এভাবেই ঘটনাটা দেখো। আমার জন্য চোখের জল ফেলো না। জানবে যে, বেঁচে থাকার তুলনায় মরে গিয়ে আমি ভালো আছি। 'ছায়ান্ধকার থেকে নক্ষত্রদের মাঝে'।

> উমা আন্না—এমন কাজের জন্য তোমার ঘরটি ব্যবহার করলাম বলে দুখিত। ASA পরিবারের সবাইকে হতাশ করলাম—এজন্য তাদের কাছে দুঃখপ্রকাশ করছি। জানি তোমরা আমাকে বড়োই ভালোবেসেছিলে। ভবিষ্যতের

ছবি : চিত্তপ্রসাদ

জন্য সর্বশ্রেষ্ঠ শুভকামনা জানাই। শেষবারের মতো একবার উচ্চারণ করি—'জয় ভীম'।

নিয়মমাফিক শব্দগুলি লিখতেই ভুলে গিয়েছিলাম। আমার নিজেকে শেষ করে দেবার এই কাজের জন্য অন্য কেউই দায়ী নয়। কোনো কথা, কোনো ব্যবহারের দ্বারা কেউ আমাকে একাজে প্ররোচনা দেয়নি।

এটা আমারই সিদ্ধান্ত এবং নিতান্ত আমিই একাজের জন্য সম্পূর্ণত দায়ী। আমি যখন থাকব না, তখন আমার বন্ধুদের, আমার শত্রুদের কাউকেই যেন বিরক্ত করা না হয়।

২০১৬ জানুয়ারি মাসের ১৭ তারিখে রোহিত ভেমুলা চিঠিটি লিখে নিজের পকেটে নিয়েই দুপুরের দিকে এএসএ-এর সভায় যোগ দিয়েছিলেন। বিকেল চারটে নাগাদ এক বন্ধুর ঘরে যান এবং উদ্‌বন্ধনে জীবন আহুতি দেন। রোহিতের চিঠির কয়েকটি লাইন রোহিত নিজে হাতেই কেটে দিয়েছিলেন। সেই কয়টি লাইনের অনুবাদও নীচে উপস্থাপন করা হল।

আম্বেদকর স্টুডেন্টস অ্যাসোসিয়েশন (ASA), স্টুডেন্টস ফেডারেশন অব ইন্ডিয়া (SFI) সংগঠনগুলির যা কিছু, তার সবটাই হচ্ছে নিজের সংগঠনের স্বার্থে। সংগঠনের স্বার্থ এবং একজন ব্যক্তির স্বার্থ প্রায় কোনো সময়েই মেলে না। ক্ষমতা হাতে পাওয়া, সুযোগ পেলে বিখ্যাত হয়ে ওঠা, এসব তাদের লক্ষ্য। তারা এটা মনে করে যে, তারা সিস্টেম বদলাবার পথে এগিয়ে চলেছে। নিজেদের কাজকর্মের দাম সাধারণত বাড়িয়ে বাড়িয়ে ভাবে। এবং যে কোনো নগণ্য ঘটনা থেকে সান্ত্বনা খুঁজে বার করতে চেষ্টা করে। অবশ্য, চমৎকার সব বইপত্র এবং চমৎকার মানুষদের সঙ্গে আমার পরিচয় করিয়ে দেবার জন্য এই দুটি সংগঠনের কাছেই আমি কৃতজ্ঞ।